"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পাঠ পড়ছো, এই পাঠ পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার, তোমাদের এটা পড়তে আর পড়াতে হবে"

***প্রশ্নঃ -** দুনিয়াতে কোন্ জ্ঞান থাকার কারণে অজ্ঞান অন্ধকার আছে ?*

***উত্তরঃ -** মায়ার জ্ঞান, যার জন্য বিনাশ হয়। মুন (চাঁদ) পর্যন্ত যায়, এই জ্ঞান অনেক আছে কিন্তু নূতন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার জ্ঞান কারোর কাছে নেই। সব অজ্ঞান অন্ধকারে আছে, সকলেই জ্ঞান নেত্রের দিক থেকে অন্ধ। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। নলেজফুল বাচ্চারা, তোমরা জানো যে ওদের ব্রেণে আছে বিনাশের অভিপ্রায়, তোমাদের বুদ্ধিতে স্থাপনার অভিপ্রায়।*

ওম্ শান্তি। বাবা এই শরীর দ্বারা বোঝাচ্ছেন, এটাকে জীব বলা হয়ে থাকে। এনার মধ্যে আত্মাও আছে আর আমিও এঁর মধ্যে এসে বসি, সর্বপ্রথমে তো এটা সুনিশ্চিত হওয়া চাই। এনাকে দাদা বলা হয়। বাচ্চাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া চাই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই মন্থন করতে হবে। প্রতি কল্পে বাবা যাঁর মধ্যে অবতরণ করেন, শিববাবা নিজে বলেন - আমি এনার অনেক জন্মের শেষের জন্মে আসি। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, এটা হলো সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে শিরোমণি গীতার জ্ঞান। শ্রীমত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। সর্বশ্রেষ্ঠ মত হলো এক ভগবানের। যাঁর এই শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারাই তোমরা দেবতা তৈরী হচ্ছো। বাবা নিজেই বলেন, আমি তখনই আসি, যখন তোমরা ভ্রষ্ট মতে প্রভাবিত হয়ে পতিত হয়ে যাও। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার অর্থও বুঝতে হবে। বিকারী মানুষ থেকে নির্বিকারী তৈরী করতে বাবা আসেন। সত্যযুগে মানুষই থাকে, কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন। এখন কলিযুগে হলো সকলেই আসুরী গুণ সম্পন্ন। সবই হলো মনুষ্য সৃষ্টি, কিন্তু এটা হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি আর সেটা হলো আসুরী বুদ্ধি । এখানে হলো জ্ঞান, সেখানে হলো ভক্তি। জ্ঞান আর ভক্তি হলো আলাদা-আলাদা।ভক্তির পুস্তক কতো প্রচুর পরিমাণে আছে। জ্ঞানের পুস্তক হলো এক। এক জ্ঞান সাগরের পুস্তক একই হওয়া উচিত। যে কেউই ধর্ম স্থাপন করলে, তার পুস্তকও একটাই হয়, যাকে রিলিজিয়াস বুক (ধর্ম গ্রন্থ) বলা হয়। সর্বপ্রথম রিলিজিয়াস বুক হলো গীতা। সর্বপ্রথম আদি সনাতনদেবী দেবতা ধর্ম না কি হিন্দু ধর্ম। মানুষ মনে করে গীতার মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম স্থাপন হয়েছে। গীতার জ্ঞান কৃষ্ণ দিয়েছে। কবে দিয়েছে ? অনন্তকাল থেকে। কোনো শাস্ত্রেই তো শিব ভগবানুবাচ নেই। তোমরা এখন মনে করো এই গীতা জ্ঞান দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে, যে জ্ঞান বাবা আমাদের এখন দিচ্ছেন। একেই ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বলা হয়। গীতাতেই লেখা আছে কাম হল মহাশত্রু । এই শত্রুই তোমাদের পরাজিত করেছে। বাবা এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করিয়ে বিশ্বের মালিক করে তোলেন। অসীম জগতের পিতা এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা তোমাদের পড়ান। তিনি (শিববাবা) হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা। ইনি(ব্রহ্মা) হলেন আবার সমস্ত মনুষ্য আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। নামই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ব্রহ্মার বাবার নাম কি, তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এই তিনের পিতা কেউ তো হবেন, তাই না ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম লোকের দেবতা। তাঁদের উপরে হলেন শিব। বাচ্চারা জানে, শিববাবার যে আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা আছে তারা শরীর ধারণ করেছে, উনি তো হলেন সার্বিক ভাবে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মাই শরীর দ্বারা বলে 'পরমপিতা' । কতো সহজ কথা! একে বলা হয় 'অল্ফ আর বে' অর্থাৎ বাবা আর বাদশাহীর অধ্যয়ণ। কে পড়ান ? গীতার জ্ঞান কে শুনিয়েছেন ? কৃষ্ণকে তো ভগবান বলা যায় না। সে তো হলো দেহধারী, মুকুটধারী। শিব তো হলেন নিরাকার। ওঁনার উপর তো মুকুট ইত্যাদি নেই। উনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। একমাত্র বাবা হলেন বীজরূপ চৈতন্য। তোমরাও হলে চৈতন্য। সকল বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো। যদিও তোমরা মালিক নও, কিন্তু বুঝতে পারো যে বীজ কীভাবে ছড়ানো হয়, ওর থেকে বৃক্ষ কীভাবে নির্গত হয়। সেটা হলো জড়, এটা হলো চৈতন্য। আত্মাকে চৈতন্য বলা হয়। তোমাদের আত্মাতেই জ্ঞান আছে, আর কোনো আত্মায় জ্ঞান থাকতে পারে না। তো বাবা হলেন চৈতন্য মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ। এটা হলো চৈতন্য ক্রিয়েশন (রচনা)। সেই সব হলো জড় বীজ। এরকম নয় যে জড় বীজে কোনো জ্ঞান আছে। তিনি তো হলেন চৈতন্য বীজরূপ, তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির নলেজ আছে। বৃক্ষের উৎপত্তি, লালন-পালন, বিনাশের সমস্ত জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে। আবার নূতন বৃক্ষ কীভাবে মাথাচাড়া দেয়, সেটা গুপ্ত থাকে। তোমাদের জ্ঞানও গুপ্ত প্রাপ্ত হয়। বাবাও গুপ্ত রূপে এসেছেন। তোমরা জানো এই কলম লাগছে। এখন তো সকলে পতিত হয়ে গেছে। আচ্ছা, বীজ থেকে সর্ব প্রথম পাতা বেড়িয়েছে, সে কে ছিলেন ? সত্যযুগের প্রথম পাতা তো কৃষ্ণকেই বলা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা হবে না। নূতন পাতা ছোটো হয়। পরে বড় হয়। তো এই বীজের কতো মহিমা। এটা যে চৈতন্য। যদি দ্বিতীয়টি বের হয়ও, ধীরে ধীরে তাদের মহিমা কমে হতে

থাকে। এখন তোমরা দেবতা হচ্ছো। তাই মুখ্য ব্যাপার হলো আমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এনাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) মতো হতে হবে। চিত্রও আছে। এই চিত্র না থাকলে বুদ্ধিতে জ্ঞান আসতো কি করে। চিত্র অনেক কাজে আসে। ভক্তি মার্গে এই চিত্রের পূজা হয় আর জ্ঞান মার্গে তোমাদের এই চিত্র থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে এদের মতো হতে হবে। ভক্তি মার্গে এরকম বুঝতে পারে না যে, আমাদের এরকম হতে হবে। ভক্তি মার্গে মন্দির ইত্যাদি কতো তৈরী হয়। সবচেয়ে বেশী মন্দির কার হবে ? অবশ্যই শিববাবারই হবে। এরপর আবার ওঁনার ক্রিয়েশনেরই (রচনার) হবে। প্রথম ক্রিয়েশন হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাই শিবের পরেই এনাদের পূজা বেশী হয়। মাতা-রা যারা জ্ঞান শোনায়, তাদের পূজা হয় না। তারা তো অধ্যয়ণ করে। তোমাদের পূজা এখন হয় না। কারণ এখন তোমরা পড়াশুনা করছো। তোমাদের অধ্যয়ণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, অধ্যয়ণের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, তখন আবার তোমাদের পূজা হবে। এখন তোমরা দেবী-দেবতা হচ্ছো। সত্যযুগে কি আর বাবা পড়াতে যাবেন ! ওখানে কি আর এরকম পড়াশুনা হবে ! এই পড়াশুনা পতিতকে পবিত্র করে তোলার জন্য। তোমরা জানো, আমাদের যে এইরকম তৈরী করেন তাঁর পূজা হবে, তারপর আমাদেরও পূজা নম্বর অনুক্রমে হবে। আবার নামতে নামতে ৫ তত্ত্বেরও পূজা করতে লেগে যায়। ৫ তত্ত্বের পূজা অর্থাৎ পতিত শরীরের পূজা। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সমগ্র সৃষ্টির উপর রাজত্ব ছিলো। এই দেবী-দেবতারা রাজ্য কীভাবে আর কখন পেয়েছে? এটা কারোর জানা নেই। মানুষ তো লক্ষ বছর বলে দেয়। লক্ষ বছরের ব্যাপার তো কারোর বুদ্ধিতে বসতে পারে না, সেইজন্য বলে দেয় এটা পরম্পরায় চলে আসছে। তোমরা এখন জানো, দেবী-দেবতা ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মে কনভার্ট (পরিবর্তিত) হয়ে গেছে। যারা ভারতে আছে তারা নিজেদের হিন্দু বলে দেয়, কারণ পতিত হওয়ার কারণে দেবী-দেবতা বলা শোভা পায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে জ্ঞান কোথায়। দেবী-দেবতার থেকেও উচ্চ টাইটেল (উপাধি) নিজের উপর ধার্য করে। পবিত্র দেবী-দেবতাদের পূজা করতে গেলে মাথা ঝোঁকায়, কিন্তু নিজে যে পতিত, সেটা কি আর বোঝে !

ভারতে বিশেষতঃ কন্যাদের সামনে সকলে নত হয়। কুমারদের প্রতি তেমন করে না। মেল (পুরুষের) এর থেকে ফিমেলকে (নারীকে) বেশী সম্মান করে, কারণ এই সময় জ্ঞান অমৃত প্রথমে মাতাদের প্রাপ্ত হয়। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন । তোমরা এটাও বোঝো যে, এই ব্রহ্মা বাবা হলেন জ্ঞানের বড় নদী। জ্ঞান নদীও হয় আবার পুরুষও হয়। ব্রহ্মপুত্র নদী হলো সবচেয়ে বড়, যা কোলকাতার দিকে সাগরে গিয়ে মিশেছে। মেলাও ওখানেই বসে, কিন্তু তাদের জানা নেই যে, এটা হলো আত্মাদের আর পরমাত্মার মেলা। সেটা তো হলো জলের নদী, যার নাম ব্রহ্মা পুত্র রেখেছে। তারা তো ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলে দিয়েছে, সেইজন্য ব্রহ্মা পুত্রকে পবিত্র মনে করে। বাস্তবে পতিত-পাবন গঙ্গাকে বলা যায় না, এখানে সাগর আর ব্রহ্মা নদীর মিলন । বাবা বলেন, ইনি ফিমেল তো নয়, তবুও এনার দ্বারাই অ্যাডাপশন হয়, এটা অনেক গুহ্য বোঝার মতো ব্যাপার, যা আবার প্রায় লোপ হয়ে যায়। আবার পরে মানুষ এর আধারে শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করে। প্রথমে হাতে লেখা শাস্ত্র ছিলো, পরে বড়-বড় মোটা বই ছাপিয়েছে। সংস্কৃতে শ্লোক ইত্যাদি ছিলো না। এটা তো একদম সহজ কথা। আমি এনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা রাজযোগ শেখাই, আবার এই দুনিয়াই নিঃশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আবার ভক্তি মার্গে এই শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী হবে। মানুষ মনে করে এই শাস্ত্র ইত্যাদি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, একে বলা হয় অজ্ঞান অন্ধকার। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবা পড়ান, যার দ্বারা তোমরা আলোতে এসেছো। সত্যযুগে হলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। কলিযুগে হলো সবই অপবিত্র প্রবৃত্তির। এটাও ড্রামা। শেষে হলো নিবৃত্তি মার্গ, যাকে সন্ন্যাস ধর্ম বলে, জঙ্গলে গিয়ে থাকে। ওটা হলো পার্থিব সন্ন্যাস। থাকে তো এই পুরানো দুনিয়াতেই।বাচ্চারা, এখন তোমরা যাচ্ছো নূতন দুনিয়ায়। তোমাদের তো বাবার থেকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, তো তোমরা কতো নলেজফুল তৈরী হচ্ছো। এর থেকে বেশী নলেজ হয়ই না। সে সব তো হলো মায়ার নলেজ, যার জন্য বিনাশ হয়। তারা মুনে (চাঁদে) গিয়ে খোঁজ করে। তোমাদের জন্য কোনো নূতন ব্যাপার নেই। এই সবই হলো মায়ার দম্ভ। খুবই শো করে (দেখায় বেশী)। বেশী ডিপনেসে যায় যেন কৃতিত্ব পাওয়ার মতো কিছু করে দেখাবে। বেশী কৃতিত্ব দেখিয়ে আবার লোকসান হয়ে যায়। ওদের ব্রেণে বিনাশেরই চিন্তা আসে।কি-কি তৈরী করতে থাকে। যে তৈরী করে সে জানে এর থেকেই বিনাশ হবে। ট্রায়ালও করতে থাকে। বলেও যে দুই বেড়ালে লড়াই করলো আর মাখন তৃতীয় জন খেয়ে নিলো। গল্প ছোটো হলেও খেলা কতো বড়। নাম এদেরই উজ্জ্বল হয়। এর দ্বারাই বিনাশ স্থির হয়ে আছে। কাউকে তো নিমিত্ত হতে হবে যে। খ্রিস্টানরা মনে করে প্যারাডাইস ছিলো, কিন্তু আমরা ছিলাম না। ইসলামী, বৌদ্ধরাও ছিল না, তবুও খ্রীষ্টানদের চিন্তাধারা ভালো। ভারতবাসী বলে দেবী-দেবতা ধর্ম লক্ষ বছর আগে ছিলো, তো বুদ্ধু দাঁড়ালো তো যে না। বাবা ভারতেই আসেন, যে মহান অবিবেচক হয় তাকেই মহান বিচক্ষণ তৈরী করেন। তবে আবার তাঁকে স্মরণ করলে তবে।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কতো সহজ করে বোঝান, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সোনার পাত্র হবে, এতে ধারণা ভালো

হবে। স্মরণের যাত্রাতেই পাপ খন্ডন হবে। মুরলী না শুনলে তো জ্ঞান উধাও হয়ে যায়। বাবা তো করুণাময় হওয়ার স্ব-উন্নয়নেরই উপায় বলে দেন। শেষ পর্যন্ত শেখাতেই থাকবেন। আচ্ছা, আজ ভোগ আছে, ভোগ নিবেদন করে শীঘ্রই ফিরে আসতে হবে। এছাড়া বৈকুন্ঠে গিয়ে দেবী-দেবতা ইত্যাদির সাক্ষাৎ করা, সব হলো ফালতু। এর জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। বাবা এই রথের দ্বারা বলেন আমাকে স্মরণ করো, আমিই তোমাদের পতিত-পাবন বাবা। তোমার সাথে খাবো...তোমার সাথেই বোসব...এটা এখানকার জন্য। উপরে কীভাবে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা এই দাদার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের মানুষ থেকে দেবতা অর্থাৎ বিকারী থেকে নির্বিকারী করার জন্য গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছেন, এই বিশ্বাসের সাথে চলতে হবে। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ গুণবান হতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রার দ্বারা বুদ্ধিকে সোনার পাত্র বানাতে হবে। সর্বদা এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে, তার জন্য অবশ্যই মুরলী পড়তে বা শুনতে হবে।

বরদানঃ- শরীরের ব্যাধি থেকে চিন্তা মুক্ত, জ্ঞান চিন্তন বা স্ব-চিন্তা করতে সক্ষম শুভচিন্তক ভব*

এক হলো শরীরে ব্যাধি আসা, এক হলো ব্যাধিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া। ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া তো নির্ধারিত, কিন্তু শ্রেষ্ঠ স্থিতি থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া, এটা হল বন্ধন যুক্তর লক্ষণ। যারা শরীরের ব্যাধি থেকে চিন্তা মুক্ত হয়ে স্বচিন্তন, জ্ঞান চিন্তন করে সেই হলো শুভচিন্তক। প্রকৃতির চিন্তা বেশী করলে চিতার রূপ হয়ে যায়। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া- একেই কর্মাতীত স্থিতি বলা হয়।

স্লোগানঃ- স্নেহের শক্তি সমস্যা রূপী পাহাড়কে জলের মতো হাল্কা করে দেয়।*